IRJHSS ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER **2395-3942 (Online)**
2454-1621 (Print)

International Research Journal of Humanities & Social Science
A Peer-Reviewed Bi-lingual l Journal
Volume-I, Issue- III, October 2015, Page No. 1-8
Language: English & Bengali
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: **http://www.irjhss.com**

মধুর তোমার শেষ যে না পাই : অন্তরঙ্গ পাঠ

ড. গৌতম কুমার নাগ

সহযোগী অধ্যাপক (ফরাসী) এবং প্রধান, বিদেশী ভাষা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The object of study of the present paper is a well-known song of Tagore: modhur tomar sesh je na pai. It should be noted that this study is confined only to the poetical framework of the song; the musical aspect is excluded. We have attempted to bring out the hidden message by reading between the lines and carrying out an in depth analysis of the salient linguistic features of the song at various levels: lexical, morpho-syntactic, semantic, and phonetic. Our objective is to demonstrate that the song is built on the underlying theme of union of finite with infinite — a major theme in the universe of Tagorean thought.

Key Words: Tagorean thought, linguistic features, finite, infinite

এই নিবন্ধটি একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : মধুর তোমার শেষ যে না পাই(পূজা / ৬০৪)। গানের সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, আমাদের আলোচ্য এই গানের কাব্যরূপটি। গানের অন্তর্নিহিত বার্তাটি অনুধাবন করার জন্য আমরা এর কাব্য-অবয়বের বিভিন্ন গঠক উপাদানের বিশ্লেষণ করব । আমরা গানটি পাঠ করব বিভিন্ন স্তরে : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্য ও কলির বিন্যাস, ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য।

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ।।
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।
ম সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার ' পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ।। [১]

এই গানরচনা সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে আমরা এই নিবন্ধের সূত্রপাত করছি। নির্মলকুমারী মহলানবিশের রচনায় ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণকালে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন গানরচনার বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য গানটি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন[২] :

> স্টুটগার্টের কথা মনে পড়ে। ২১শে সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা এক জার্মান পরিবারের বাড়ী কবি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। বিকেল বেলা তাঁদের বাড়ীর ছাদে নিয়ে গেলেন সেখান থেকে গোটা সহরটাই চোখ পড়বে বলে। কবির সাদা মাথায় সূর্যাস্তের লাল রং যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। আকাশের সেই অপূর্ব রঙের খেলা আজও ভুলিনি। সেইদিন হোটেলে ফিরে কবি লিখেছিলেন:

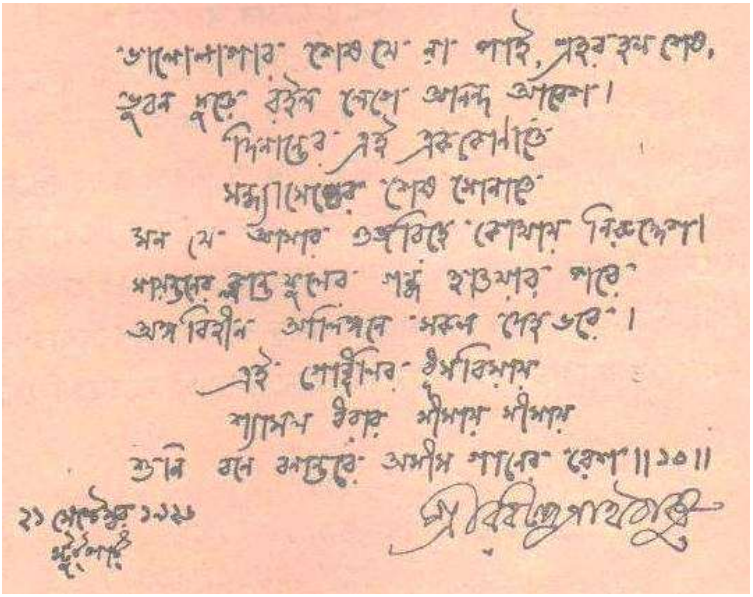

দেখা যাচ্ছে অন্যান্য অনেক গানের মত এই গানরচনার নেপথ্যে কোন ''কাহিনি'' নেই, এমন কিছু নেই যাকে সেই অর্থে "ঘটনা" বলে অভিহিত করা চলে। প্রাপ্ত তথ্যে শুধুমাত্র সেই মুহূর্তের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যাচ্ছে এই গান রচিত হয়েছিল এক পরম রমণীয় সন্ধ্যার পটভূমিতে। এই নিবন্ধে আমরা দেখব তৎকালীন বাস্তব নৈসর্গিক পটভূমির সঙ্গে গানে চিত্রায়িত আবহের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এছাড়া লক্ষণীয় গানের প্রাথমিক রূপটিতে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। একটি পরিবর্তন কলির বিন্যাসে। আটকলিবিশিষ্ট এই গানের সংখ্যা প্রথমে ছিল দশ। অন্তরা ও আভোগের কলির সংখ্যা ছিল তিন কিন্তু পরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম দুটি কলিকে একটি কলিতে অন্তর্ভুক্ত করে কলির সংখ্যা তিন থেকে দুইয়ে নামিয়ে আনা হয়। আর একটি পরিবর্তন শব্দচয়নের ক্ষেত্রে। গানের শুরুতে "ভালোলাগার" স্থানে "মধুর তোমার" শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে ; এরপর সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলিতে "দেহ"র পরিবর্তে "অঙ্গ'র প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সংশোধন গানের কাব্যরূপ পাঠকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে আমরা সেই প্রসঙ্গেও আসব।

এই গানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর বৃহত্তর অংশে "সন্ধ্যা" বা তার সমার্থক শব্দের ব্যবহার । গানের চারটি তুকের মধ্যে তিনটিতে অর্থাৎ গানের তিন চতুর্থাংশে দেখা যায় প্রথম কলিতে এমন শব্দের উপস্থিতি। অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের প্রথম কলির শুরুতে যথাক্রমে "দিনান্তের" " সায়ন্তনের" ও "গোধূলির" ; অন্তরাতে শুধু প্রথম কলির শুরুতেই নয়, কলির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও সন্ধ্যার উপস্থিতি ("সন্ধ্যামেঘের")। এই পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ এই গানটিকে সমধর্মী গানগুলির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। সন্ধ্যা বা সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা একশ একান্ন। আমরা সেইসব গান বেছে নিয়েছি যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের আলোচ্য গানে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত চারটি শব্দের একটি অথবা তাদের দুটি প্রতিশব্দের একটি। "দিনান্ত" "সন্ধ্যা" "সায়ন্তন" "গোধূলি" "সাঁঝ" "প্রদোষ" — এই শব্দগুলির মধ্যে অন্তত একটি ব্যবহৃত হয়েছে এমন গানের সংখ্যা (আমাদের আলোচ্য গানটিকে বাদ দিয়ে) আমরা চিত্রকারে উপস্থাপন করছি :

ব্যবহৃত শব্দ	গানের সংখ্যা
দিনান্ত	০৪
সন্ধ্যা	১০৪
সায়ন্তন	০০
গোধূলি	১৫
সাঁঝ	৩৬

প্রদোষ	০৪

সন্ধ্যার উপস্থিতিযুক্ত একশ একান্নটি গানের মধ্যে একশ বত্রিশটি গানে সন্ধ্যা বা কোন সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে শুধু একবার। বাকি উনিশটি গানের মধ্যে সতেরটিতে একই শব্দের দুবার প্রয়োগ ঘটেছে অথবা দুটি সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অথবা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে আর একটি সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই ; আমাদের আলোচনার পক্ষে যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে ওই সতেরটি গানের কোনটিতেই দুটির বেশি তুকে সন্ধ্যা বা তার সমার্থক শব্দের উপস্থিতি নেই। দেখা যাচ্ছে আমাদের আলোচ্য গান ছাড়া তিনটি তুকে এমন শব্দপ্রয়োগ ঘটেছে শুধু দুটি গানে। গানদুটি হল "এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন" (পূজা / ৫৬৮)[৩] এবং "আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে" (পূজা / ১৪১)[৪]। প্রথম গানটিতে তিন তুকে "সাঁঝ" শব্দের (সাঁঝের রঙে) ব্যবহার চারবার ; দ্বিতীয় গানে পাঁচবার "গোধূলি" শব্দের (গোধূলিলগন) ব্যবহার।

উল্লিখিত তথ্যের পরিপ্রক্ষিতে আমাদের আলোচ্য গানটির স্বাতন্ত্র্য পর্যালোচনা করা যাক। আমরা উল্লেখ করেছি এই গানে সন্ধ্যা ও তার সমার্থক শব্দের ব্যবহার তিনটি তুকে ; আমরা দেখলাম এমন দৃষ্টান্ত আর মাত্র দুটি আছে। দ্বিতীয়ত ওই ব্যতিক্রমী গানদুটিতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; শুধুমাত্র প্রথম গানটিতে পুনরাবৃত্ত "সাঁঝ" শব্দের সঙ্গে একবার "সন্ধ্যা" শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে চারটি ভিন্ন সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক থেকে এই গানটি সন্ধ্যার উপস্থিতিযুক্ত গানের মধ্যে অনন্য। সন্ধ্যার এমন ব্যতিক্রমী বৈচিত্র্যময় উপস্থিতির ব্যাখ্যা সম্ভবত গানরচনার পটভূমি থেকে পাওয়া যেতে পারে। নির্মলকুমারী মহলানবিশের বিবরণ অনুসারে যে অবিস্মরণীয় মনোরম সন্ধ্যায় গানটি রচিত হয়েছিল, তারই সৌন্দর্য কবির মগ্নচেতনায় যে স্বপ্নমায়াজাল বিস্তার করেছিল, গানে সম্ভবত তারই অভিব্যক্তি সন্ধ্যার বারংবার আবির্ভাবে।

সান্ধ্য রূপকল্পের প্রাধান্য থাকলেও এই গানের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়চেতনায় প্রতিভাত সান্ধ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের বাণীরূপায়ণ নয়। সমস্ত গান জুড়ে কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত মুগ্ধ ভাবাবেশের স্পর্শ পাওয়া যায়। স্বপ্নমেদুর সেই অনুভবের উৎস কিন্তু গোধূলিবেলার অনুপম শোভা নয়। তেমন পাঠ গ্রহণযোগ্য হত যদি গানটির কোন সংশোধন না করে প্রাথমিক রূপটিই অপরিবর্তিত রাখা হত। সেক্ষেত্রে গানের শুরুর অন্তহীন "ভালোলাগার" কারণ বলে চিহ্নিত করা যেত দিনান্তবেলার রূপমাধুরীকে — "সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনা" "সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ" "গোধূলির ধূসরিমা"। কিন্তু গানের শুরুতে পরিবর্তনের কারণে — " ভালোলাগার" পরিবর্তে "মধুর তোমার" শব্দবন্ধের প্রয়োগের ফলে — এই ব্যাখ্যা আর প্রযোজ্য থাকে না। এবার কবির স্বপ্নাবেশবিভোর অনুভূতির উৎস এক অনিঃশেষিত মাধুরীধারা — যার কেন্দ্রবিন্দু "তুমি"।

শুরুতে এই সংশোধনে গানটি এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। "মধুর তোমার" এই শব্দবন্ধে অভিব্যক্ত অনুভূতি অনেক গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ— তার পাশে "ভালোলাগাকে" নিষ্প্রভ মনে হয়। এছাড়া এই শব্দবন্ধের সৌন্দর্য এর অস্পষ্টতায়, এর দ্ব্যর্থবোধকতায়। "মধুর" শব্দটির দুটি পাঠ সম্ভব। প্রথমত এটি বিশেষ্য "মধু"র সম্বন্ধপদের রূপ হতে পারে। দ্বিতীয়ত এটি বিশেষণ "মধুর" হতে পারে ; সর্বনাম "তুমি"কে বিশেষিত করতে এর প্রয়োগ। সেই অনুসারে প্রথম কলির প্রথমার্ধের দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব। "শেষ যে না পাই" পদগুচ্ছে অভিব্যক্ত অন্তহীনতার অনুভূতি। বিশেষ্য "শেষ"এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে বিশেষ্য "মধু" অথবা সর্বনাম "তুমি"। অর্থাৎ একটি পাঠ অনুসারে "তোমার মাধুর্য" অনন্ত ; দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে অনন্ত মধুময় "তুমি"। দুটি ব্যাখ্যাই সমান গ্রহণযোগ্য। "তোমার মধু" আর "মধুর তুমি" যেন পরিপূর্ণ একাত্মতা লাভ করে। এই আলোচনায় আমরা দেখব গানের বৃহত্তর অংশে সেই মাধুরীমায়ার বিস্তারের রূপায়ণ। এই বক্তব্যের আলোকে আমরা গানের বিভিন্ন তুকের বিশ্লেষণ করব।

আস্থায়ীর সূচনা এক বৈপরীত্যের অনুভূতি সঞ্চারে। প্রথম কলির নির্মানের ভিত্তি এক দ্বন্দ্ব। সমগ্র গানটিতে শুধুমাত্র প্রথম কলিতেই দেখা যায় একই কলিতে দুটি বাক্যের অবস্থান। দুটি বাক্যে — প্রথমে নঞর্থক বাক্যে, তারপর সদর্থক বাক্যে — "শেষ" শব্দের পুনরাবৃত্তি অশেষ ও শেষের, অসীম ও সীমার সেই দ্বন্দ্বের রূপায়ণ। কলির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে স্থিত "প্রহর"কে প্রথমার্ধে বর্ণিত সেই মধুময় সান্নিধ্যের জন্য নির্দিষ্ট পর্বরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেই মাধুরীধারা অনন্ত ,অসীম; তার পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু কালগত পরিসরটি সসীম। অন্যভাবে বলা চলে উৎসারিত সেই মাধুরী কালের সীমানা অতিক্রম করে যায়। প্রথম কলিতে দেখি অশেষ ও শেষের, অসীম ও সীমার সহাবস্থান। পরবর্তী কলিতে শুধুই অসীম বিস্তার।

কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত "আনন্দ আবেশ" পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় নিখিল ভুবনে। আস্থায়ীর দুই কলির মধ্যে পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বের আর একটি স্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে— স্থান ও কালের দ্বন্দ্ব। কালগত পরিধিটি সসীম, সীমাহীন স্থানগত পরিধিটি।

সীমা অসীমের এই দ্বন্দ্বের বিস্তার গানের পরবর্তী অংশের বৃহত্তর পরিসর জুড়ে। বাকি অংশের কথাবস্তুর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা বিভিন্ন অংশের লক্ষণীয় গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরব। এরপর আমরা দেখব এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশের ভাববস্তুর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা।

প্রথমেই অন্তরা ও আভোগের মধ্যে একটা গঠনগত প্রতিসাম্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম সাদৃশ্য বাক্যের সংখ্যা ও কলির বিন্যাসে। আস্থায়ীতে দুটি কলিতে তিনটি বাক্য, সঞ্চারীতে দুটি কলিতে দুটি বাক্য কিন্তু বাকি দুই অংশে আমরা দেখি একটি বাক্য দুটি কলিতে বিস্তৃত। দুটি বাক্যই চারটি অংশে বিভক্ত — প্রতিটি কলিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। উভয় তুকেরই প্রথম কলির দুই অর্ধাংশের শেষে অধিকরণের উপস্থিতি— "কোণাতে" "সোনাতে" " ধূসরিমায়" "সীমায়"। সবক্ষেত্রেই ক্রিয়ার আধার নির্দেশ করা হয়েছে। এই আধারের অবস্থান এবং সংখ্যা এক। এরপর উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় কলিতে প্রথমার্ধে ক্রিয়া— পার্থক্য এই যে অন্তরায় ক্রিয়ার অবস্থান এই অর্ধাংশের শেষে ("গুঞ্জরিছে"), আভোগে শুরুতে ("শুনি")। উক্ত ক্রিয়াদুটির মধ্যে একটা চরিত্রগত ঐক্য আছে— দুটি ক্রিয়াই শ্রুতিচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কথাবস্তুর দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এই দুই তুকেই প্রথম কলিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের উপস্থিতি (দিনান্ত, সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনা/ গোধূলির ধূসরিমা, শ্যামল ধরা) দ্বিতীয় কলিতে শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্পের (গুঞ্জরণ / অসীম গানের রেশ)। আভোগে অবশ্য শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্পের সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পের সহাবস্থান : বন বনান্তর।

গানের বাকি অংশের বিশ্লেষণ করতে আমরা প্রথাগতভাবে অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের পর্যায়ানুক্রমিক পাঠ না করে প্রথমে গঠনগতভাবে প্রতিসম অন্তরা ও আভোগের পাঠ করব। আমরা দেখব এই দুই অংশের মধ্যে ভাবগত ঐক্যও রয়েছে। সেইসঙ্গে মধ্যবর্তী সঞ্চারী অংশটির স্বাতন্ত্র্যটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে— যে স্বাতন্ত্র্যের কারণে আমরা এই আলোচনাটি এখন স্থগিত রেখে পরবর্তী মুহূর্তে শুরু করব।

আমরা উল্লেখ করেছি আস্থায়ীর বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে এক অসীম পরিব্যাপ্তির অনুভূতি, আছে স্থান ও পূর্ববর্তী কালগত পরিধির বৈপরীত্য। অন্তরার শুরু স্থান ও কালের বৈপরীত্যের বিলুপ্তিতে, উভয়ের একাত্মকরণে। "কোণা" শব্দযোগে কালদ্যোতক "দিনান্ত" স্থানগত পরিসরের স্থান নেয়। এই শব্দটি একই সঙ্গে সেই পরিসরের সঙ্কুচিত রূপটিরও সঙ্কেতবাহী। সীমানার সঙ্কোচনের এই অনুভূতি অন্তরার পরবর্তী দুই অংশেও অভিব্যক্ত। প্রথম কলির শেষার্ধে আসে দৃষ্টিচেতনার জগৎ, তারপর পরবর্তী কলির প্রথমার্ধে শ্রুতিচেতনার জগৎ। সন্ধ্যাকাশে স্বর্ণলেখার দৃশ্যকল্পটি বিলীয়মান। তারপর আসে এক অস্ফুট, মৃদু ধ্বনি— গুঞ্জরণ। দুই চেতনাজগৎ দুটি সঙ্কুচিত পরিধি। আস্থায়ী অংশের শেষে অন্তহীন পরিব্যাপ্তির পর অন্তরা অংশের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে থাকে এক সঙ্কোচনশীল সীমানার চিত্র। তারপরই অকস্মাৎ আবার সেই অনন্ত পরিব্যাপ্ত পরিধি। গানের উৎসারিত মাধুরীর মত মুগ্ধহৃদয়ের নিরুদ্দেশ যাত্রাপথেরও কোন অন্ত নেই। গানের এই অংশে অশেষ, অসীম বা অসীমতাদ্যোতক সমার্থক কোন শব্দ না থাকলেও "কোথায় নিরুদ্দেশ" শব্দবন্ধের প্রয়োগে এই পরিসর যেন আকস্মিকভাবে অন্তহীন বিস্তার লাভ করে। ক্ষুদ্র সীমা থেকে এক মুহূর্তে উত্তরণ ঘটে যায় অসীম অনন্তে।

অন্তরার সমান্তরালভাবে আভোগেও দ্বিতীয় কলির শেষার্ধে অসীমের উপস্থিতি এবং পূর্ববর্তী তিন অংশে অর্থাৎ প্রথম তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে সীমার অবস্থান। তবে অন্তরার মত আভোগে রূপায়িত চিত্ররূপটি সঙ্কোচনশীল সীমার নয়, বরং বিপরীতভাবে সম্প্রসারণশীল সীমার। অন্তরার "শেষ সোনার" স্থান নেয় "গোধূলির ধূসরিমা" ; দিবা অবসানে সেই স্বর্ণালোকরেখা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, কিন্তু ধূসরিমা ধীরে ধীরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকে। এর পরবর্তী দুটি অর্ধাংশে দেখা যায় যুগ্মশব্দের ব্যবহার : "সীমায় সীমায়", "বনে বনান্তর"। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য "বন" শব্দটির সরাসরি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে না, তবে গাওয়ার সময় "বনান্তরে" শব্দটি দুইবার গাওয়া হয়। এই পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে স্থানগত পরিসরের বিস্তৃতি।

এই গানে শুধুমাত্র আভোগেই দেখা যাচ্ছে সীমা ও অসীমের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। আমরা দেখেছি আস্থায়ীতে দুইয়ের সহাবস্থানে নির্দেশ করা হয়েছে "শেষ" শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। অন্তরাতে সীমা বা অসীমতাদ্যোতক সুস্পষ্ট কোন শব্দের প্রয়োগ ঘটে নি। এই অংশের রূপকল্পগুলির গভীরতর পাঠের মাধ্যমেই সীমা অসীমের প্রচ্ছন্ন অবস্থান অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র এই আভোগ অংশেই সুস্পষ্ট ভাষায় দুইয়ের উপস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছে। গানে প্রথমবার "সীমা" "অসীম" শব্দযুগলের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে।

আলোচ্য দুই অংশের শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্পের তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে। অন্তরায় আছে গুঞ্জরণধ্বনি, আভোগে অসীম গানের রেশ। এই দুই অংশের মধ্যে ঐক্য রচনা করে সঙ্গীত— প্রথমে মৃদু অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি, তারপর সর্বত্রব্যাপী এক মহাসঙ্গীত। অন্তরায় স্বপ্নাবেশবিভোর কবির অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত গুঞ্জরণধ্বনি ধাবিত হয় অসীম, অনন্তের উদ্দেশে— এ যেন অসীমের উদ্দেশে প্রেরিত সীমার সঙ্গীতবার্তা। আভোগে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় বনে বনান্তরে তা যেন সীমার উদ্দেশে প্রত্যুত্তরে প্রেরিত অসীমের বাণী। অন্তরায় সীমা থেকে অসীমে উত্তরণ, আভোগে অসীম এসে ধরা দেয় সীমায়। এই দুই অংশের একত্র পাঠে সম্পূর্ণ হয় সীমা অসীমের মিলনের আখ্যান। সঙ্গীত সেই মহামিলনের সেতুবন্ধ রচনা করে।

এবার আমরা গঠনগতভবে স্বতন্ত্র সঞ্চারী অংশের আলোচনায় আসব। শুধু অবয়ব গঠনের ক্ষেত্রে নয়, মর্মবস্তুর পর্যায়েও এই অংশের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। সীমা অসীমের মিলনের ভাববস্তুটি এই অংশের নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা বা হলে কেমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তার আগে প্রাথমিক পাঠেই গঠন ও কথাবস্তুর স্তরে এই অংশের যে সমস্ত স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করব।

গানের বাকি অংশের সঙ্গে সঞ্চারী অংশের পার্থক্য অন্ত্যমিলে। আস্থায়ী অংশের অন্ত্যমিল "-এশ" ধ্বনিগুচ্ছে। অন্তরা ও আভোগ অংশে দুই কলির অন্ত্যমিল নেই ; উভয় অংশের শেষ কলির শেষে -"এশ" ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে গানে ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদলের (closed syllable) অন্ত্যমিল । শুধুমাত্র সঞ্চারী অংশেই দেখি স্বরান্ত বা মুক্তদলের (open syllable) অন্ত্যমিল (-"রে" ধ্বনিগুচ্ছে: পরে/ভরে)।

কথাবস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অন্তরা ও আভোগে বিধৃত ইন্দ্রিয়চেতনাজগৎ— দৃষ্টির জগৎ , শ্রুতির জগৎ— সঞ্চারী অংশে চিত্রিত হয় নি ; দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্প এই অংশে অনুপস্থিতি। সঞ্চারীতে উপস্থাপিত অন্য দুই ইন্দ্রিয়চেতনাজগৎ— সৌরভের জগৎ,(সান্ধ্য ফুলের সুবাস), স্পর্শের জগৎ (আলিঙ্গন)। এই দুই চেতনাজগৎ এই অংশের পরপর দুটি কলিতে উপস্থাপিত। এই দুটি কলি দুটি পৃথক বাক্য— যা এই গানে সঞ্চারী অংশের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই অংশের স্বাতন্ত্র্য শুধু বাক্য ও কলির বিন্যাসে নয়, দুই কলির পারস্পরিক সম্বন্ধেও। আমরা দেখেছি অন্তরা ও আভোগ একটিমাত্র বাক্য দুই কলিতে বিস্তৃত। আস্থায়ীতে দুই কলিতে তিনটি বাক্য; দুই কলির মধ্যে একটা আর্থ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কলির "আনন্দ আবেশ" এবং পূর্ববর্তী কলির "মধুর তোমার" এর মধ্যে একটা কার্যকারণসম্পর্ক ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সঞ্চারী অংশের দুই কলি পরস্পর অসম্পৃক্ত। দুটি বাক্য দুই ভিন্ন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বিবরণ; তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

গভীরতর পাঠে আপাত অসম্পৃক্ত এই দুই কলির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে। এই দুটি কলিকে ইন্দ্রিয়চেতনার রূপান্তরের বাণীরূপায়ণ বলে ভাবা যেতে পারে। পুষ্পসুরভিত সান্ধ্যবাতাস দেহে মৃদু পরশ দিয়ে যায়। সৌরভ যেন রূপান্তরিত হয় স্পর্শে। এখানে মনে করা যেতে পারে "আমার মন মানে না" গানটির আভোগের প্রথম কলিটি:

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে[৫]

দুটি ক্ষেত্রে গন্ধ স্পর্শের স্থান নেয়। যা ঘ্রাণচেতনাগ্রাহ্য তাই স্পৃশ্য হয়ে ওঠে। দুই ভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্যবর্তী বিভাজনরেখা কখন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

এমন রূপান্তর শুধু ইন্দ্রিয়চেতনার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা এক দ্বিমাত্রিক রূপ লাভ করে। যে আলিঙ্গনস্পর্শ সর্ব অঙ্গ পূর্ণ করে তোলে, সেই আলিঙ্গন শরীরী পরশ নয়। অশরীরী স্পর্শ শরীরী রূপ পরিগ্রহ করে। দুই ভিন্ন শরীরী চেতনার মত ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে, দেহ এবং দেহাতীতের মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না।

এবার আমরা দেখব অন্য তিন অংশে এযাবৎ আলোচিত সীমা-অসীমের ভাবনা সঞ্চারী অংশে স্থান পেয়েছে কিনা। অন্তরার মত সঞ্চারীতেও কোথাও এমন ভাবনা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয় নি ; এখানেও কোথাও "সীমা" "অসীম" বা সমার্থক কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নি। গভীরতর পাঠে দেখা যায় অন্তরা বা আভোগের মত সঞ্চারীতে গানের গতিপথ সীমা থেকে অসীমে নয় বা অসীম থেকে সীমায় নয়। এই গতিপথ সীমা থেকে নূতনতর সীমায়— অসীম এই তুকে অনুপস্থিত। সৌরভের স্পর্শে রূপান্তর, দেহাতীত অনুভূতির শরীরী অনুভূতিতে রূপান্তরকে বিপরীত বা ভিন্নতর চেতনার মধ্যবর্তী সীমানার অবলুপ্তিরূপে বা এক সীমা থেকে ভিন্নতর সীমায় উত্তরণরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সীমা-অসীমের ভাবনা সমগ্র গানে কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবার আমরা তার সংক্ষিপ্তসারটুকু দেখে নেব। আস্থায়ীতে সীমা ও অসীমের সহাবস্থান। অন্তরায় সীমা থেকে অসীমের উদ্দেশে যাত্রা। সঞ্চারীতে সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সীমা থেকে অন্যতর সীমায় প্রবেশ ঘটে তারপরই আভোগে অসীম এসে ধরা দেয় সীমার দ্বারপ্রান্তে।

সীমা অসীমের যে পূর্ণমিলনে গানের সমাপ্তি ঘটে তার উৎস গানের শুরুতে— উৎস "তুমি" থেকে প্রবাহিত অনন্ত মাধুরীধারা। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতে বলা যায়:

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে।।
কোথা কে আছে নাহি জানি—
তোমার মাধুরীপানে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে।।[৬]

এই প্রেমসুধারসে, এই মাধুরীপানে কবিচিত্তে সঞ্চারিত অনুভবের প্রকাশ সমস্ত গান জুড়ে। মুগ্ধচেতনায় নিখিল বিশ্ব মধুময় হয়ে ওঠে— প্রহর অতিক্রান্ত হলেও সেই মাধুরীসঞ্জাত "আনন্দ আবেশ" "ভুবন জুড়ে" রয়ে যায়। সেই আবেশে বিভোর কবিহৃদয়ের গভীরে জাগে গুঞ্জরণধ্বনি— সেখান থেকেই অসীমের উদ্দেশ্যে অভিসারযাত্রার শুরু। আবার সেই আবেশবিভোর হৃদয়েই ফিরে আসে অসীম গানের রেশ। "ডুবেছে মন"— মনের এই নিমগ্নতার মুহূর্তে সীমা-অসীমের মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে যায়।

"মধুর"— গানের প্রথম ও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের সঙ্গে মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষের সহাবস্থান— যথাক্রমে সর্বনামের সম্বন্ধপদের রূপ "তোমার" এবং ক্রিয়ারূপ "পাই"। গানে "মধুর"এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মধ্যম ও উত্তমপুরুষের ভূমিকার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে। আমরা দেখেছি গানের প্রাথমিক রূপটিতে মধ্যমপুরুষ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল এবং এই সংযোজনের ফলে শুরুতে বর্ণিত সেই অনুভূতির উৎসস্থলটি পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা দেখেছি এই উৎস আর ইন্দ্রিয়চেতনাবেদ্য সান্ধ্য সৌন্দর্য নয়, এই উৎস সেই সম্ভাষিত "তুমি" । এই "তুমি"র চকিত আভাসটুকু শুধু এই গানের শুরুতে মেলে; সেই সম্ভাষিতের আর কোন পরিচয় এই গানে উন্মোচিত হয় না। গানের বাকি অংশে মধ্যমপুরুষ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমগ্র গানটি পাঠের পর এই "তুমি" ইন্দ্রিয়চেতনার অন্তরালস্থিত বিশ্বসৌন্দর্যলীন এক অরূপসত্তারূপে প্রতিভাত হয়। তার প্রকাশ শুধুই উদ্বেল মাধুরীধারায়।

উত্তমপুরুষের প্রয়োগ এই গানে মোট তিনবার। আমরা দেখলাম গানের প্রথম কলির শুরুতে ক্রিয়ারূপ উত্তমপুরুষের, কর্তা এখানে উহ্য। অনুরূপ প্রয়োগ শেষ কলির শুরুতে: ক্রিয়ারূপ "শুনি"। এছাড়া চতুর্থ কলিতে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সম্বন্ধপদের রূপের প্রয়োগ: আমার। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ্য "মন"। "মন" বা "আমার মন"এর অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। এই অবস্থান গানের কেন্দ্রস্থলে— আটকলিবিশিষ্ট গানের চতুর্থ কলিতে। উল্লেখ্য গানের প্রাথমিক দশকলিবিশিষ্ট রূপটিতে এই অবস্থান ছিল পঞ্চম কলিতে । অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপে কলির সংখ্যার পরিবর্তন সত্ত্বেও "মন" বা "আমার মন" এর "কেন্দ্রীয়" অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে।

এই কেন্দ্রীয় অবস্থান কি "আমার মনের" কেন্দ্রীয় ভূমিকার ইঙ্গিতবাহী? দেখা যাচ্ছে উত্তমপুরুষের অবস্থান এই গানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তমপুরুষের উপস্থিতি গানের শুরুতে, কেন্দ্রস্থলে ও শেষে। গভীরতর পাঠে দেখা যাবে কেন্দ্রস্থিত মন— "আমার" মনই এখানে নিয়ামক শক্তি। গানের শুরু ও শেষের ক্রিয়াতে এই "আমার" মনেরই ভূমিকা। প্রথম কলির প্রথমার্ধে মাধুর্যের পরিমাপের যে প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে সেখানে ক্রিয়াসম্পাদনকারী কবিমন ছাড়া কিছু নয়। এই অংশে "আমার মনের" ক্রিয়াশীলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু গানের শেষে আপাতদৃষ্টিতে মনের কোন ভূমিকা নেই। "শুনি" এই ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা। কিন্তু "শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়" "বনে বনান্তরে" যে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় সে তো শ্রুতিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এ হল সেই গান— "যে গান কানে যায় না শোনা"। এই গান কানে নয় "প্রাণের শ্রবণে" শোনা। এখানে শ্রুতিরিন্দ্রিয়ের ভূমিকা পালন করছে মন— আমার মন। গানের সর্বত্রই উত্তমপুরুষের উপস্থিতি অনুভব করা যায় কবিমনের ক্রিয়াশীলতায়।

প্রাথমিক পাঠে দেখা যায় সঞ্চারীতে উত্তমপুরুষ অনুপস্থিত। শুধুমাত্র এই তুকেই শরীরী স্পর্শ পাওয়া যায়। এখানেই আছে "অঙ্গ"— গানের প্রাথমিক রূপে ছিল "দেহ"। এরই ভিত্তিতে বলা চলে উত্তমপুরুষ এই তুকেও উপস্থিত কিন্তু তার অবস্থান

অন্তরালে। "অঙ্গ"র সঙ্গে উহ্য উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপ: "আমার অঙ্গ"। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু ভিন্নতর পাঠও সম্ভব। "অঙ্গ" এখানে সাধারণভাবে মানবদেহকেও নির্দেশ করতে পারে। যেমন আমরা "সারা জীবন দিল আলো" গানের আভোগে আমরা দেখি:

সকল দেহে প্রভাতবায়ু ঘুচায় অবসাদ [৭]

তেমনিভাবে বলা চলে গন্ধবিধুর সান্ধ্যসমীরণ মানবদেহে (সকল দেহে, শুধু কবির দেহে নয়) জাগায় অনির্বচনীয় পরশমাধুরী। সুতরং দেখা যাচ্ছে অন্য তিন তুকে উত্তমপুরুষ , তার অভিব্যক্তি মনের ক্রিয়ায়। অন্যদিকে সঞ্চারীতে — যেখানে উপস্থিত "অঙ্গ" বা "দেহ" সেখানে উত্তমপুরুষের উপস্থিতি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। অবশ্য এমন কথা বলা যাবে না যে সমগ্র আভোগে মনের কোন ভূমিকা নেই। আভোগের প্রথম কলি বা প্রথম বাক্য সম্বন্ধে এই বক্তব্য প্রযোজ্য। এখানে আছে শুধুই বহিঃপ্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ; মনের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পরবর্তী কলিতে "অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন" সম্পূর্ণভাবে কবিমনেরই নির্মাণ। আমাদের ব্যাখ্যা ছিল সুবাসিত সান্ধ্যবাতাস দেহে সেই অশরীরী আলিঙ্গনের অনুভূতি সঞ্চার করছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে সন্ধ্যাবাতাস বা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক আবহ সেই অনুভূতির সৃষ্টি করছে না, মাধুর্যের যে অনুভূতি কবিহৃদয়কে গানের শুরু থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে , তাই এই অংশে শরীরী রূপ লাভ করছে।

আমরা এই নিবন্ধ শেষ করব এই গানের কাব্যরূপের ধ্বনিগত গঠনের আলোচনা দিয়ে। আস্থায়ীতে আমরা দেখি দুটি কলিতে 'ন্' এবং 'জ্' ধ্বনি পৃথকভাবে ব্যবহৃত : "**যে না**" "ভুবন **জু**ড়ে"। (পৃথক বর্ণ হলেও এইস্থানে '**জ্**' ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পরবর্তী অন্তরা অংশের শেষ কলিতে ধ্বনিদুটি যুক্তব্যঞ্জনরূপে এসেছে : **মন যে**, গু**ঞ্জ**রিছে। প্রথম ক্ষেত্রে 'ন্' এবং 'জ্' ধ্বনির অবস্থান পৃথক শব্দে হলেও যুক্তব্যঞ্জনধ্বনিরূপে তারা উচ্চারিত হচ্ছে : **ঞ্জ**। অর্থাৎ এই অংশে আমরা দেখছি '**ঞ্জ**' ধ্বনির অনুপ্রাস। অন্তরার প্রথম কলিতে 'ন্' এবং ত্' ধ্বনি পৃথকভাবে ব্যবহৃত : "কো**ণা**তে" 'সো**না**তে"। পরবর্তী সঞ্চারীর প্রথম কলিতে বর্ণদুটি যুক্তধ্বনি '**ন্ত**' রূপে উচ্চারিত হচ্ছে : "সায়**ন্ত**নের" "ক্লা**ন্ত**"। এক কলিতে পৃথক পৃথক ধ্বনির পরবর্তী কলিতে সংযুক্তিকরণ যেন ঐকতান রচনার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস।

এরপর সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলিতে দেখা যায় '**ঙ্গ**' ধ্বনির অনুপ্রাস। এখানেই গানে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংশোধনের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। বিশেষ্য "দেহ"এর স্থানে বিশেষ্য "অঙ্গ"এর প্রয়োগে আর্থস্তরে গানের কোনরকম পাঠান্তর হয় নি। কিন্তু ধ্বনিগত স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। "**অঙ্গ**বিহীন আলি**ঙ্গ**ন" শব্দবন্ধে '**ঙ্গ**' যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস "**অঙ্গ**" শব্দের প্রয়োগে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এর আগে একই কলিতে যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির ('**ঞ্জ**' , '**ন্ত**') প্রয়োগ ঘটেছে দুইবার। সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলিতে গানে এই প্রথম যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির তিনবার প্রয়োগ ঘটল।

এই যুক্তধ্বনির অনুপ্রাসের একটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরপর তিনটি কলিতে— গানের চতুর্থ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ কলিতে যথাক্রমে তিন যুক্তধ্বনির পুনরাবৃত্তি। প্রথমে 'ন' ও 'জ' যুক্তধ্বনির পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে যেন তারের যন্ত্রের গুঞ্জরণধ্বনি বেজে ওঠে। এরপর 'ন'র সঙ্গে 'ত' ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে তারযন্ত্রের ধ্বনির সঙ্গে যেন যুক্ত হয় তালযন্ত্রের রব। তারপর 'ঙ' ও 'গ'— দুটি সঘোষ কণ্ঠ্যধ্বনি তার মধ্যে একটি নাসিক্য ধ্বনি— এমন যুক্তধ্বনির দীর্ঘতর পুনরাবৃত্তি এক গম্ভীরতর ধ্বনি ,এক মন্দ্ররব সৃষ্টি করে।

আভোগে যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস আর নেই।এবার আমরা দেখি শব্দের পুনরাবৃত্তি—"সীমায় সীমায়" "বনান্তরে বনান্তরে" (বনান্তরে শব্দটি গানের কাব্যরূপে একবার থাকলেও দুইবার গাওয়া হয়)। সীমা থেকে উৎসারিত গুঞ্জনধ্বনির সঙ্কেত দিতে শুধু যুক্তধ্বনির পুনরাবৃত্তি, কিন্তু অসীম গানের ব্যঞ্জনা বহন করে দীর্ঘায়িত ধ্বনিমিল— ধ্বনির পরিবর্তে শব্দের পুনরাবৃত্তি।

সীমা-অসীমের মিলনের ভাবনা রবীন্দ্রচিন্তাবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর "প্রকৃতির প্রতিশোধ" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনার পালা। [৮]

আমরা এই ভাবনার আলোকে গানের কাব্যরূপটি বিশ্লেষণ করেছি। এটি অবশ্য গানের একমাত্র পাঠ নয়,অন্যতম সম্ভাব্য পাঠ মাত্র।

উল্লেখপঞ্জী

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৩৭
২) মহলানবিশ, নির্মলকুমারী, কবির সঙ্গে য়ূরোপে, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৫০
৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২২৩-২২৪
৪) তদেব, পৃ ৬৫-৬৬
৫) তদেব, পৃ ২৯৫
৬) তদেব, পৃ ৮৪২
৭) তদেব, পৃ ১৪৭
৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩,পৃ ৫০০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা, রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩
রায়, আলপনা (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০
সরকার, পবিত্র, দ্বন্দ্ববিরোধ, রবীন্দ্রসংগীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, কলিকাতা, প্রতিভাস, ২০১৩